বৌদ্ধদর্শনে জীবন ও মৃত্যু

সাধনকমল চৌধুরী

মৃত্যু জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। দুঃখদায়ী মৃত্যুর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। কবি বলেছেন, 'জন্মিলে মরিতে হবে'। মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। এটাই দুঃখের চরমতম রূপ!

গৌতম বুদ্ধ জীবকে দুঃখ থেকে ত্রাণ করবার জন্যেই সাধনায় নেমেছিলেন। জীবন যে দুঃখময় এই সত্য তিনি মনে - প্রাণে উপলব্ধি করে জীবের দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কঠোর তপস্যার পর 'বুদ্ধত্বলাভ' -এর মাধ্যমে তিনি জীবের দুঃখমুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। শুধুমাত্র দুঃখমুক্তির উপায় নয়। তিনি উদ্ভব করলেন এক নতুন ধর্মদর্শন যা প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্মদর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

বৌদ্ধদর্শন কয়েকটি বিশেষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো হচ্ছে—অনিত্যতা, অনাত্মা ও নিরীশ্বরবাদ। আর তার সঙ্গে রয়েছে নিরন্তর দুঃখ-সত্য।

অনেকে বলেন, এই যে পরিবর্তন তাতে কিছু কোনো কিছুই বিলোপ হচ্ছেনা। অনু - পরমানুর ক্ষয় নেই। সুতরাং বস্তু পদার্থ হিসাবে থেকেই যাচ্ছে। তবে সেটাও পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন কার্য - কারণ সাপেক্ষ। এই কার্য - কারণ তত্ত্বে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও আর থাকে না। সংখ্যাদর্শনও এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনিত্যকে মেনে নিলে নিত্য কিছুই আর থাকে না। বুদ্ধ তাই নিত্য কিছুই মানেননি। তিনি জগতের সকল কিছুর মধ্যে অনিত্যতাই উপলব্ধি করেছেন। নিত্য কিছুই বুদ্ধ জগতে দেখেননি।

বুদ্ধ আত্মায় বিশ্বাস করেননি। এই জগতের মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে যে আত্মা রয়েছে বলে বলা হয়,বুদ্ধের মতে, এটা হচ্ছে নিছক কল্পনা মাত্র। নিত্য কোনো আত্মা নিত্য কোনো শরীরে অবস্থান করতে পারে না। শরীরের কিছু অংশ নিত্য এবং কিছু অংশ অনিত্য হতে পারে না। তাছাড়া, অনিত্য সংসারের নিত্য কিছু থাকে কী করে?

উপনিষদে আত্মার কথা বলা হয়েছে। আত্মা মানুষের অন্তঃস্থলে রয়েছে। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আত্মা রয়েছে, সেই আতমা পর - ব্রাহ্মেরই অংশ বিশেষ। তাই আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, আত্মা নিত্য। আত্মা অশরীরী রূপে অনিত্য বস্তুর মধ্যে বর্তমান। আত্মাকে জানা কঠিন। এই শরীর রথ হলে আত্মা হল রথচালক। আত্মা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, আবার বিশাল থেকে বিশালতর। আত্মা সর্বত্র বিচরণ করে। আত্মার কারণেই মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মিলনসুখ উপলব্ধি করে। অতএব আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। আত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রূপে শরীরের মধ্যে অবস্থান করে। তিনি আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। তিনি সর্বক্ষণ বর্তমান। আত্মা জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হয় না, আত্মা জন্মহীন, শাশ্বত। দেহের নাশ হলেও আত্মার বিনাশ নেই।

আবার গীতায় বলা হল, মৃত্যুতে আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে। একে বলা হয় জন্মান্তর। আত্মা পরব্রহ্মের সঙ্গে লীন হলে তবেই মুক্তি, না হলে মানুষকে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়

উপনিষদে বর্ণিত আত্মাকে বুদ্ধ মানেননি। উপনিষদের আত্মা বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলোকে বুদ্ধ মোটেই আমল দেননি। 'অয়ং ভিকখবে! কে বলো পরি পুরো বাল - ধম্মো' (মজঝিমনিকায়) বলেছেন বুদ্ধ। অর্থাৎ 'হে ভিক্ষুগণ! এই গুলি নিছকই বালখিল্যদের চিন্তাধারা।'

বুদ্ধের ধর্মদর্শনে উপনিষদ্- এর এবং গীতার আত্মা নেই এবং সেই কারণে জন্মান্তরও নেই, ঈশ্বরও নেই।

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই এই দেশে আত্মা এবং জন্মান্তরের কথা প্রচলিত ছিল। মৃত্যুর রোমেও জন্মান্তরের ধারণা ছিল। সেই দেশের প্রাচীন ড্রাইডরা বলতেন, 'Souls do not die, but pass at death from one to another'।

দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর পর আত্মা যে নতুন দেহ ধারণ করেছে এটা শুধুমাত্র এই দেশের ধর্মবিশ্বাস নয়, এই বিশ্বাস বহু দেশেই প্রচলিত ছিল। উত্তর আমেরিকার অরণ্যবাসীদের মধ্যে, আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইহুদিদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ছিল। তাদের প্রাচীন তালমুদ-এ তার উল্লেখ আছে।

ঠিক এই রকম ধারণা প্রাচীন মিশর, ইটালী এবং গ্রিসেও ছিল। প্রাচীন আইরিকণাও আত্মা এবং মৃত্যুর পর জন্মান্তরের কথা মানতেন।

বোঝা যাচ্ছে উপনিষদ -এর কালে বিদেশি ধ্যান - ধারণাগুলো এই দেশে বেশ ভালোভাবেই দানা বেঁধেছিল। এই ধোঁয়াটে বিষয় প্রাচীন আর্য ঋষিরাও উপনিষদ-এ ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু গৌতমবুদ্ধ এসে যেন সব কিছুওলট - পালট করে দিলেন। তিনি জন্মান্তর এবং নিত্য আত্মা বলে কিছু মানলেন না। '(he changed the whole aspect and practical effect of the doctrined he retained by disconnection them from the soul theory out of which they has grown and on which they had hitherto depended.' (India and Buddhism - Rhys Davids)

বুদ্ধ এক নতুন ধ্যান - ধারণার জন্ম দিলেন। তিনি আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি নস্যাৎ করে মানুষের মুক্তির নতুন পথ দেখালেন। তিনি উপনিষদ মানলেন না বুদ্ধের ধর্মদর্শনে উপনিষদ -এর ছায়া মাত্র নেই। এই ধর্মদর্শন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের পরিত্রাণের কথা বলল।

জীবনের পরে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি নয়। তৃষ্ণার কারণে মৃত্যুর পর আবার পুনর্জন্ম হবে। নতুন জীবন এবং আবার দুঃখের শুরু। তারপর আবার মৃত্যু এবং আবার পুনর্জন্ম। এইরূপে মানবজীবনে দুঃখ চক্রাকারে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। দুঃখ থেকে মুক্তি নাই।

কিন্তু বুদ্ধ সেই দুঃখমুক্তির পথ দেখিয়েছেন, বলেছেন তৃষ্ণার ক্ষয় হলে মৃত্যুর পর আর পুনর্জন্ম নেই। পুনর্জন্ম রোধেই মানুষের মুক্তি। কারণ জীবন না থাকলে দুঃখও আর থাকবে না। এটাই হচ্ছে নির্বাণ। বুদ্ধ এই নির্বাণের কথা বলেছেন যা মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়।

কোনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নয়। কোনো দেব - দেবী নয়। মানুষ নিজেই নিজের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে, কারণ 'মানুষ নিজেই নাথ, নিজেই গতি।' (ধম্মপদ)

জন্মান্তরবাদ কী করে মানুষের মধ্যে ঠাঁই পেল বলা শক্ত। বেদের যুগে দেখা যাচ্ছে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুবরণ করছে, ব্যাধিতে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, যুদ্ধে মানুষ মরে যাচ্ছে। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ আবার জন্মাচ্ছে কোথায়? যে যায় সে যাচ্ছে, কিন্তু সে তো আবার ফিরে আসছে না? তবে জন্মান্তর কোথায়?

ঋগ্‌বেদে বলা হল যে দেবতারা অমর। তাঁরা সঠিক যজ্ঞ করে অমর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর আবার জীবনলাভ করে। অর্থাৎ দেবতারাও শশীরে কেউ অমর হচ্ছে না। সুতরাং মানুষও সঠিক যজ্ঞ করলে মৃত্যুর পর আবার জীবন পেয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারবে। হয়তো বেদের এই উক্তির কারণেই মানুষের মধ্যে নবজন্মের ধারণা সৃষ্টি হল। মৃত্যু মানুষের কাছে বিভীষিকা - স্বরূপ। মৃত্যুর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। অথর্ব সংহিতায় বলা হয়েছে স্বয়ং যমেরও নাকি মৃত্যু হয়েছিল।

এই মৃত্যুভয় অতিক্রম করার জন্যে হয়তো প্রাচীনকালের মানুষ কল্পনা করেছিল যে মৃত্যু একটা সাময়িক ব্যাপার, কারণ এরপর নতুন জীবনের উদয় হবে। উপনিষদ বলল, মানুষ ও সকল প্রাণীর মধ্যে অবিনশ্বর আত্মা রয়েছে। মৃত্যুর পর সেই আত্মা অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। সে নতুন দেহ এবং জীবন প্রাপ্ত হয়। এটাই হল জন্মান্তর বা transmigration of soul। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নবজন্মের শেষেও মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে। অর্থাৎ আবার তাকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই বার বার মৃত্যুর কথা বলা হল উপনিষদ্ -এ। 'মানুষ শস্যের মতো মরে, আবার শস্যের মতো পুনর্জাত হয়' (কঠ উপননিষদ্-১/১/৬)।

কিন্তু এই যে নবজন্ম সেটায় কি রকম জীবন লাভ হবে? এই প্রশ্ন মানুষকে ভাবাল। এই জন্মে যে জীবন - যন্ত্রণা ভোগ করা হল, তা কি আবার প্রাপ্ত হবে এই নতুন জীবনে? উপনষিদ্ বলল, 'পরজন্মে মানুষের প্রতিষ্ঠা কী রকম হবে তা নির্ধারণ হয় এ জন্মের কর্মের এবং জ্ঞানের কারণে' (কাঠ উপনিষদ—২/২/৭)। এইখানে কর্মফল এসে গেল।

এইবার মানুষ আর যজ্ঞ করাই সঠিক কর্ম বলে মানল না। যজ্ঞের পরিবর্তে ইন্দ্রিয় দমনের কথা, লোভ, মোহ ত্যাগের কথা বলল। এইসব করে মানুষ শুদ্ধ হলে পরজন্মে উচ্চ বর্ণে গিয়ে জন্মাবে। নইলে মানুষ কর্ম ফলে নীচ যোনিতে জন্মাবে। আর এই অশুদ্ধ কর্মের ফলভাগ করার জন্যে জীবকে বারবার জন্মাতে হবে এবং দুঃখভোগ করতে হবে। এইখানে ধর্মে নিয়তিবাদও এসে গেল। পূর্বজন্মের কর্মের ফলে এই জন্মে যে প্রাপিত, সেটাই নিয়তিরূপে মানব জীবনে প্রতিভাত হল। ব্রাহ্মণরা মানুষকে তাই বোঝালেন। নিয়তির উপর কারও হাত নেই। যেটা ঘটার তা ঘটবে। পূর্ব জন্মের যে কর্ম করা হয়েছে তার ফলস্বরূপ ভোগ কপালে ঘটবেই। নিয়তিকে ঠেকানো যায় না।

পুরাণে নিয়তিবাদ নিয়ে নানা কাহিনি লেখা হল। গ্রিকরাও নিয়তি নিয়ে নানা কিছু লিখলেন। গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিস্ নিয়তিবাদের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর বিখ্যাত নাটক 'ওয়েদিপাউস' রচনা করলেন। মহাযানী বৌদ্ধরা কর্মবাদ যবং নিয়তি নিয়ে গুপ্তযুগে এত বাড়াবাড়ি করলেন যে বুদ্ধকে জড়িয়ে তাঁরা বেশ কিছু 'জাতক' লিখে ফেললেন। বৌদ্ধদর্শনের এবং বুদ্ধের আদর্শের তোয়াক্কা না করে তাঁরা উপনিষদ্ -এর ধারা অব্যাহত রেখে দেখালেন যে পূর্বজীবনের কর্মের ফলে মানুষ মৃত্যুর পর পশু হয়ে জন্মাছে, প্রাণী হয়ে জন্মাছে, গাছ হয়ে জন্মাচ্ছে, কীট হয়ে জন্মাচ্ছে ইত্যাদি। খ্রিস্ট পূর্ব প্রথম সহস্রব্দের শেষার্ধে এইসব কাল্পনিক কাহিনিগুলো রচিত হয়। 'জাতক' প্রণেতারা মাহামানব বুদ্ধকেও ছাড়লেন না। কাহিনিগুলোর সত্যতা প্রমাণের জন্য বুদ্ধকেও নীচে নামালেন। তাঁরা বুদ্ধকে পাঁচশো পঞ্চাশ জন্ম পরিভ্রমণ করালেন তাঁদের কাহিনির মাধ্যমে। এইভাবে তাঁরা বৌদ্ধদর্শনকে নস্যাৎ করে উপনিষদ্ -এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

উপনিষদ্ -এর নিয়তিবাদ (বুদ্ধ যা মানেননি) এবং কর্মফলের ব্যাখ্যা সুদৃঢ় করতেই জাতকের উদ্ভব। এইসব কাহিনির মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। জাগতে জন্মান্তরেই প্রকাশ পেয়েছে, বুদ্ধের পুনর্জন্মবাদ নয়। এরকম ধৃষ্টতা ভারতবর্ষের আর কোনো ধর্মপ্রচারককে নিয়ে কখনও করা হয়নি। বুদ্ধের ধর্মদর্শনে নিয়তিবাদ নেই। সকল কিছুই এই ধর্মে কার্য - কারণ সাপেক্ষ নিয়তি বলে কিছু নেই এই ধর্মদশনে। উপনিষদ্ জন্মান্তরের কথা বলে তার লেজুড় হিসেবে কর্মফল, নিয়তিবাদ ইত্যাদি ধর্মে নিয়ে এসেছে। বলা চলে বিদেশি fatalism একসময় এই দেশের ধর্মের মধ্যে এইভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। তবে এগুলো এসেছে বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পরে। অবশ্য সবটাই অনুমাণ। আর এই অনুমাণগুলো কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর মাধ্যমে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া হল।

আসলে মানুষের মন থেকে মৃত্যু ভয় দূর করার জন্যেই জন্মান্তরবাদের উদ্ভব হল। মানুষ মৃত্যুর পর আবার জন্মাবে, একথা জানলে মৃত্যভয় খানিকটা দূর হবে। তাছাড়া ভালো কর্ম করলে মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে সুখে থাকবে, এটাও তাকে ভালো কর্ম করতে প্রেরণা জোগাবে।

কিন্তু এতে কী হল? ভালো কর্ম বলতে কী বোঝায়? সবটাই তো আপেক্ষিক। মৌলবাদীরা তো মানুষকে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে জঘন্য কাজ করাচ্ছে। ধর্মকে বিকৃত করে মানুষকে বুঝিয়ে বিধর্মী হোক বা স্বধর্মী হোক তাদের আদর্শকে মানে না এমন লোককে তারা নৃশংসভাবে খুন করাচ্ছে, বলছে এটাই ধর্মীয় কাজ। এটা করলেই তুমি স্বর্গে যাবে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা সারা বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে তারা ধর্মের অহিফেন খাইয়ে ভালো কর্ম এবং ধর্মীয় কর্ম বলে লেবেল দিয়ে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। সবটাই করা হচ্ছে ওই জন্মান্তর বা মৃত্যুর পর সুখ স্বর্গে গিয়ে হুরি - পরীদের নিয়ে ভোগ - কেলি করতে পারবে বলে টোপ দিয়ে। এই জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে পরজন্মে নতুন সুখজন্ম লাভের লোভ কিছু মানুষ এইভাবে অমানুষের উপর ভিত্তি করে অকূলে ঝাপ দিচ্ছে। ধর্মের নামে যে যা বলছে এবং শাস্ত্রগুলোতে কী লেখা আছে ইত্যাদি বিচার - বিশ্লেষণ না করে সব কিছু বিশ্বাস করে মেনে নেওযা যায় না। অন্ধবিশ্বাস আর অকুণ্ঠ ভক্তি মানুষকে ধর্মের অন্ধগলিতে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

রামায়ণের কথায় আসা যাক। সীতা হচ্ছেন লক্ষ্মীর অবতার। তবু তিনি সারা জীবন কঠিন কষ্টভোগ করলেন। পূর্বজন্মের কী

কর্মের ফলে এটা হল? মহাকাব্যে তার কোনো সদুত্তর নেই। অথচ উপনিষদ বলে গেছে কর্মের ফলে মানুষের এই জন্মে সব দুঃখ কষ্ট!

এবার মহাভারতের কথা বলি। মহাভারতের এক অংশে বলা হল যে মানুষ নিজের দোষে বা গুণে (এই জন্মের) দুঃখ বা সুখ ভোগ করে। এটা অবশ্য বুদ্ধেরই কথা।

আবার এই মহাকাব্যের আর জায়গায় বলা হল, নিয়তি মানুষকে দুঃখ, সুখ প্রদান করে। আবার পরে বলা হল, কিছু নিয়তির কারণে আর কিছু নিজের কর্মের দোষে মানুষ ফল ভোগ করে। এইরূপ পরস্পর বিরোধী ও অপকর্ম আমরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে দেখতে পাই। এখানে দেখছি পূর্বজন্মের দোশ কর্মই কেবল ফল দিচ্ছে, তবে সুকর্ম কোনো ফল দিচ্ছে না।

সুতরাং বলা যায়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের কর্মফল মতবাদে প্রচুর ফাঁক রয়েছে। সবটাই মনে হয় অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঋষিরা 'নিয়তি' আমদানি করলেন! 'কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃষ্টা' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১/২)

বুদ্ধ জন্মান্তর গ্রহণ করেননি। তিনি প্রাচীন জন্মান্তরবাদ ত্যাগ করে নিয়ে এলেন পুনর্জন্মবাদ। বুদ্ধ বললেন, মৃত্যুতে মানুষের সব কিছু এখানেই শেষ হয়ে যায়। মানুষ পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায়। কিছুই ওপারে যায় না। কিন্তু মৃত্যুতে মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে গেলেও তার কামনা বাসনা বা তৃষ্ণা পুনরায় জন্ম ঘটায়। জন্মগত স্বভাব বা সংস্কার নতুন জীবনের চরিত্রকে গঠন করে এটা তার সম্পূর্ণ নতুন জীবন— পুনর্জন্ম। 'The dead Buddhist does not revive, but another revives in his Stead.' (A. Barth) মৃত্যুর পর কোনোরূপ সংক্রমণ বা সংক্রান্তি নেই। মৃত্যুতে মানুষের জাগতির সব কিছু শেষ হয়ে যায়। অমর 'আত্মাবলে'ও দেহে কিছু নেই যে থাকবে। 'নৈরাত্ম'ই বুদ্ধের ধর্মদর্শন। প্রফেসর রীজ ভেডিডস্ বলেছেন, 'There is no migration of a soul, but there is magration of character, A Good man dies and he is dead for ever, but his goodness does not perish and causes another good and happy man to be born.'

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মৃত্যুর পর জন্ম অবশ্যম্ভাবী ঘটনা'। বুদ্ধ তা মানেননি। তিনি বলেছেন, জন্মকে রোধ করা যায়। কেনন জন্ম হয় তা জেনে তার নিরোধে জন্মেরও নিরোধ, দুঃখেরও নিরোধ হয় বিশ্বকবি বলেছেন, 'মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে।'

এই পৃথিবীর বুকে মানুষের উদ্ভব হচ্ছে প্রকৃতির এক হঠাৎ চমক। মানুষই জগতের একমাত্র সৃষ্টি নয়। মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভব হয়েছে কেবল একশ হাজার বছর আগে। পৃথিবীর বয়স তার চেয়ে ঢের বেশি বহু প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং মানুষ এই জগতের একমাত্র সৃষ্টি নয়। সেই সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নানা মিথ্ - এর উদ্ভব করেছে। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে কিছু ছিল বা আছে কিনা সঠিক না জেনেও মানুষ তাঁকে সৃষ্টিকর্তা রূপে আসন দিয়েছে। তাঁর শাস্তিস্বরূপ 'নরক' এবং উপহার স্বরূপ 'স্বর্গ' বানিয়েছে।

তবে কিছু মানষ এই মিথ্ মানলেন না। তারা বললেন, মানুষ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে না পেরে কাল্পনিক ঈশ্বরের ঘাড়ে সেই বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চন্ত হয়েছে'। চালর্স ডারউইন সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের মিথ্ ভেঙে দিলেন। তিনি বললেন, ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেননি। মানুষ তো নয়ই। মানুষ লেজহীন এক প্রজাতির বানরের উন্নত সংস্করণ মাত্র। ঠিক এইখান থেকেই নিরীশ্বরবাদ পাশ্চাত্যে প্রবল আকারে জেগে উঠল।

ভারতবর্ষে কিন্তু বহু আগে থেকেই নিরীশ্বরবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেশে যেসব ধর্মদর্শন প্রচলিত ছিল যেমন জৈন, বৌদ্ধ, চার্বাক (লোকায়ত), পূর্ব মিমাংসা (মিমাংসা) সাংখ্য, বেদান্ত (উত্তর মিমাংসা) ও ন্যায় বৈষেশিক তাদের মধ্যে রয়েছে নিরীশ্বরাদী দর্শন।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিদেশি প্রভাবে একসময় এই দেশেও ঈশ্বরবাদ এসে জুটল। শতপথ ব্রাহামণ - এবাইবেলের আদম - ঈভের কাহিনি রয়েছে মানব ও প্রাণী সৃষ্টির কাহিনিতে যদিও 'প্রজাপতি' হচ্ছেন এখানে সৃষ্টিকতা বা ঈশ্বর । এই কাহিনি 'বিষ্ণুপুরাণ' -এও রয়েছে। মনু সরাসরি ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলেছেন। এইভাবে একসময় নানাযুগে ঈশ্বরবাদ এই দেশে নানা পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে খ্রিষ্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর, এই দেশের নিরীশ্ববাদী ধর্মদর্শনে ও ভক্তিবাদের জাগরণে ঈশ্বর, নিয়তি, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি ঢুকে গেছে। এগুলো মহাযানী বৌদ্ধদের মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্মদর্শনেও ঢুকল। বিচ্ছিরি এক জগাখিচুরি ব্যাপার!

মানুষের অজ্ঞানতাই ঈশ্বরকে নিয়ে এসেছে মানুষের মধ্যে। এই অজ্ঞানতার কারণেই ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানো, যক্ষ, রাক্ষস, স্বর্গলোক ও তাঁর বাসিন্দা, নরক ও তাঁর বাসিন্দা ইত্যাদি ঠাঁই পেয়েছে এই দেশের নানা ধর্মে। বিদেশি পণ্যের মতো তৎকালীন পিছিয়ে পড়া দেহগুলোর অন্ধবিশ্বাসগুলোও একসময় এস পৌঁছায় এই দেশে, আর এই দেশের কিছু মানুষের অজ্ঞানতাকেই তা পুষ্ট করেছিল।

বৌদ্ধদর্শন বলে জগতের সকল কিছুই অনিত্য। সুতরাং নিত্য সত্তা বলে কিছু থাকার কথা নয়। প্রতি মুহূর্তে সব কিছুবদলে যাচ্ছে। এই আছে তো এই নেই। বুদ্ধের দর্শনে তাই আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, স্বর্গ নেই, নরক নেই, দেব - দেবী নেই। অর্থাৎ শাশ্বত কিছুই নেই। তাই এই ধর্মে শুধু মানুষের কথা রয়েছে, জাগতিক বিষয়ের কথা রয়েছে। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বহু যুগ পরে এঞ্জেলস বলেছেন, 'That alkl nature, from the smallest thing to the biggest...has its existence in eternal comming into being and going out of being, in caseless flux, in inresting motion and change. (Marx & Engels selected Works)'। গৌতমবুদ্ধও তাই বলেছেন আড়াই হাজার বছরেরও আগে। কবি বলেছেন, 'যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা'।